Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 338 – 345
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

অস্তিত্ব সংকটের প্রেক্ষিতে বাংলা নাটক : একটি পর্যালোচনা

নিতাই পাল
Email ID : nitaipaul151098@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Existence, Despair, Loneliness, Depression, Death, Crisis, Mechanics, Light, Darkness.

Abstract
What should I call existence? Merely living in some sense cannot be called existence. Who am I? What am I doing? Why are you doing? We have to find the answers to all these questions, only then we can face our own existence. 'This is me' – I have Discover myself; otherwise, they will suffer from the crisis of their existence.

According to existentialists, if a man behaves like everyone else instead of being what he really wants to be, he is actually alienating himself from himself. Everyone agrees that the ordinary life of man is not the real or proper existence of man. Existentialists did not want to call existence as living in the traditional currents as everyone else does without being aware of their freedom, dignity and individuality. But in this stream, does everyone want to float? Or under the pressure of society and surroundings, he is gradually forced to float in that stream. He is losing his existence.

This issue of existential crisis has also particularly affected literature. This existential crisis has come up in the writings of many writers from the West to the East. The subject of my discussion is how this crisis of existence has emerged in the subject of my discussion is how this existential crisis is reflected in Badal Sarkar's 'Ebong Indrajit', Shambhu Mitra's 'Chand Baniker Pala' and Mohit Chattopadhyay's 'Kanthanalite Surya'.

Discussion

প্রচলিত অর্থে 'অস্তিত্ব' বলতে বোঝায় থাকা বা বিদ্যমানতাকে। তবে শুধু বেঁচে থাকাই কি অস্তিত্ব? বেঁচে থাকা আর অস্তিত্ব রক্ষা করা একই জিনিস নয়। অস্তিত্ব এমন এক জিনিস যা অর্জন করতে আমাদের সংগ্রাম করতে হয়। আমি কে? আমি কি করছি? কেন করছি? এই সমস্ত প্রশ্নে উত্তর আমাদের খুঁজে বের করতে হবে, তবেই আমরা নিজেদের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করতে পারবো। যারা এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে অপারগ, তারা আজ অস্তিত্ব রক্ষার

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-40
Website: https://tirj.org.in, Page No. 338-345
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লড়াইয়ে বিফল। তারা হয়তো জীবিত, তবে ভেতর থেকে সবাই মৃত। একেকজন জীবন্ত লাশ হয়ে বেঁচে আছে। এই অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে টিকে থাকতে হলে সর্বপ্রথম নিজেদের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করতে হবে।

আজ চারিদিকে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে আত্মহত্যার মতো ঘটনা। এর জন্য দায়ী কে? আমরা আজ রয়েছি অত্যাধুনিক যুগে, বিজ্ঞানের দয়ায় মানুষ আজ উন্নতির চরম শিখরে। প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। দিন দিন মানুষ হচ্ছে যন্ত্রের দাস। যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে মানুষ নিজের অস্তিত্বকে ভুলতে বসেছে। মানুষের জীবনে নেমে এসেছে ভয়ংকর শূন্যতা; মানুষের কোনো মর্যাদা নেই, স্বাধীনতা নেই, মানুষের অস্তিত্ব আজ যন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল। মানুষকে বুঝতে হবে তার একটা নিজস্ব ব্যক্তি সত্তা আছে। ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন হতে হবে, বুঝতে হবে অস্তিত্বকে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে-

> "প্রত্যেক মানুষকে স্বনির্ধারিত পথে আত্মপোলব্ধি করতে হবে। অন্য কেউ তার হয়ে এ-কাজ করে দিতে পারে না; কেননা, উপলব্ধি একান্ত ভাবে ব্যক্তিসাপেক্ষ।একেই বলে 'আত্মস্থতা' (inwardness)।"[১]

আবার, একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তারপরেই সমাজ তার পিঠে চাপিয়ে দেয় এক বোঝা। তারপর সেই বোঝাটি বইতে বইতে সে যখন বড় হয়, তখন তাকে পড়তে হয় সামাজিক দায়বদ্ধতার ঘেরাটোপে। সে কি চায়, তার কি করতে ভালোলাগে এসবের প্রাধান্য থাকে না সেখানে। সে ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ে, একাকীত্ব নিঃসঙ্গতার জ্বালা ভোগ করতে থাকে। নিজের অস্তিত্বকে সে আর খুঁজে পায়না।

আর, সেই সঙ্গে বর্তমান সভ্যতার কালো অন্ধকার ক্রমশই গ্রাস করে চলেছে মানুষকে। আমরা আজ এক ভয়ংকর দুঃসময়ের শিকার। সাধারণ মানুষের জীবন অনিশ্চিত। সময়জনিত নৈরাশ্য ক্রমশ মানুষকে অস্তিত্ব সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। হিংসা, হানাহানি, বেকারত্বে মানুষ আজ দিশেহারা। সর্বত্র এক হতাশার ছবি।

অস্তিত্বের সংকট রচনাকারদের মধ্যে জন্ম দিয়েছে এক বিশেষ প্রবণতার। এই প্রবণতা সাহিত্যে কিভাবে ফুটে উঠেছে, তা আমি বাদল সরকারের 'এবং ইন্দ্রজিৎ', শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা' ও মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

বাদল সরকার 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে মধ্যবিত্ত জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, অবসাদ ও মধ্যবিত্ত জীবনের একঘেয়েমি কিভাবে মানুষকে অস্তিত্ব সংকটের মুখে ঠেলে দিচ্ছে তারই এক চিত্র তুলে ধরেছেন। প্রথম অংকে দেখা যায় লেখক কিছু লেখার চেষ্টা করছে, তারপর আবার ছিঁড়ে ফেলেছে। এক সময় হতাশ হয়ে বলেন-

> "লেখক।। ... কিছু লিখবার নেই আমার।
> মানসী।। কিছু লিখবার নেই?
> লেখক।। কী লিখব? কাকে নিয়ে লিখব? ক-টা মানুষকে চিনি আমি? ক-জনের কথা জানি?"[২]

এই আক্ষেপের জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে যাদের ডাক দেন, যাদের সঙ্গে পরিচিত হয়, তারা অমল-বিমল-কমল। নামের ধ্বনিসাম্যে, অন্তমিলে নিরুদ্বেগ পরিবেশ তৈরি করে। তবে চতুর্থজন যখন সাম্য বজায় রেখে বলে 'নির্মল', তখন লেখক চিৎকার করে ওঠে -

> "লেখক।। না! কি নাম আপনার?
> চতুর্থ দর্শক।। ইন্দ্রজিৎ রায়।
> লেখক।।তবে কেন নির্মল বলেছিলেন?
> ইন্দ্রজিৎ।।ভয়ে।
> লেখক।।কিসের ভয়?
> ইন্দ্রজিৎ।।অশান্তির। নিয়মের বাইরে গেলে অশান্তি।"[৩]

নিজের অস্তিত্বকে স্বাধীনসত্তা রূপে স্বীকৃতি দিয়ে স্বাধীনতা প্রয়োগ করায় যথার্থ অস্তিত্ব। এখানে আমরা দেখতে পেলাম ইন্দ্রজিৎ নিজের অস্তিত্বকে স্বাধীন রূপে প্রকাশ করতে পারছে না, কারণ তার মনে ভয়ের দানা বেঁধেছে। সে জানে আমরা এক নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ, সেই বেড়াজাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইলেই বাঁধবে অশান্তি। তাই ইন্দ্রজিৎ

নিজের অস্তিত্বকে লুকিয়ে রেখে নিয়মের স্রোতে গা ভাষাতে চেয়েছে। এভাবে কি বেঁচে থাকা যায়? যেখানে নিজের অস্তিত্বকে প্রকাশ করা যায় না। একে ধরনের মৃত্যুই বলা চলে। তাইতো লেখক ইন্দ্রজিৎ-কে বলে-

> "লেখক।। মৃত্যু?
> ইন্দ্রজিৎ।। এখনও হয়নি।
> লেখক।। ঠিক জানেন?
> ইন্দ্রজিৎ।।না। ঠিক জানিনা।"[৪]

এরপর লেখক নাটকে তুলে ধরেছেন অস্তিত্বহীন মধ্যবিত্তদের, অমল-বিমল-কমল হল এই শ্রেণীর প্রতিনিধি। তাদের কোন নিজস্বতা নেই। পুতুল নাচের পুতুলের মত তারা নেচে চলেছে। 'ক্রিকেট-সিনেমা-ফিজিক্স-রাজনীতি-সাহিত্য'তে আবর্তিত হচ্ছে এইঅমল-বিমল-কমলদের জীবন। এই একঘেঁয়ে জীবনের গান-

> "এক-দুই-তিন
> এক-দুই-তিন-দুই-এক-দুই-তিন
> এক-দুই-তিন-দুই-এক-দুই-তিন
> চার-পাঁচ-ছয়
> চার+পাঁচ-ছয়-পাঁচ-চার-পাঁচ-ছয়
> চার-পাঁচ-ছয়-পাঁচ-চার-পাঁচ-ছয়
> সাত-সাত-আট-নয়
> সাত-আট-নয়-আট-সাত-আট-নয়
> সাত-আট-নয়-আট-সাত-আট-নয়
> নয়-আট-সাত-ছয়-পাঁচ-চার-তিন
> দুই-এক"[৫]

এক থেকে নয় আবার নয় থেকে এক সংখ্যায় ফিরে আসা; এটা কি গান? না কোনো এক আবর্তনের অংক। যাই হোক এই ডুবে যাওয়া, পচে যাওয়া একঘেয়ে জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চাই ইন্দ্রজিৎ। সে বলে –

> "ইন্দ্রজিৎ।।এক-এক সময় ইচ্ছে করে সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে পড়ি।
> লেখক।।কোথায় যাবি?
> ইন্দ্রজিৎ।।জানিনা কোথায়। অনেক দূরে কোথাও! কি আছে অনেক দূরে তাও জানিনা।"[৬]

তখন 'এবং' নামক সংযোজক অব্যয় যোগে আলাদা ব্যতিক্রমী নায়ক ইন্দ্রজিৎ-কে বুঝে নিতে অসুবিধা হয়না। অস্তিত্ববিহীন জীবন ইন্দ্রজিৎকে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। সে চেয়েছিল নিজের মতো করে বাঁচতে, চেয়েছিল নিজের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করতে, চেয়েছিল জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু এই সব কথা ছকবাঁধা নিয়মের বাইরে বেরিয়ে আসতে। সে বলে-

> "ইন্দ্রজিৎ।। জানি না।আমিও মানি। বহু নিয়ম মানি। লেখাপড়া করা নিয়ম-মেনেছি। পরীক্ষা দেওয়া নিয়ম-মেনেছি। চাকরি করা নিয়ম-মানব। কিন্তু একটা কথা বলতো?
> মানসী।। কি?
> ইন্দ্রজিৎ।। সবই তো মানছি। কিন্তু নিয়ম মানাটাই উচিত এ কথাটাও কি মানতে হবে?
> মানসী।। না মেনে কি করব?
> ইন্দ্রজিৎ।। নিয়মটাকে ঘেন্না করব। অন্তত সেটুকুও তো বাকি থাকা দরকার।"[৭]

আমরা এক সময় দেখতে পাই যে এই ছকবাঁধা নিয়মের বাইরে বেরিয়ে আসবার লড়াইয়ে ইন্দ্রজিৎ ক্রমশ হাঁপিয়ে ওঠে। সে বলে,

> "জানিনা। আমি অনেক ভেবেছি। অনেক যুক্তি তর্ক বিচার মনে মনেকরেছি। সব কিছুর উত্তর-জানিনা। কেমন যেন ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। যুক্তি তর্ক আর ভালো লাগে না। কিছু করতেও পারছি না। শুধু ক্লান্ত লাগছে। ঘুমোতে ইচ্ছা করছে।"[৮]

সে কখনো নিজের অস্তিত্বকে অতি তুচ্ছ ভেবে বলেছে,

> "বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আমার অস্তিত্ব একটা অদৃশ্য ধূলিকণার চেয়েও অর্থহীন।"[৯]

তাই সে নিজেকে শেষ করে দেবার কথাও চিন্তা করেছে,

> "আমাকেও তো একদিন না একদিন ঐরকম মরতে হবে। এখনই মরি না কেন? "[১০]

নিজের জীবনের প্রতি, অস্তিত্বের প্রতি তার বিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। মানসী ইন্দ্রজিৎকে বেঁচে থাকবার কথা বললে, সে বলে ওঠে-

> 'মানসী।। মরে যেয়োনা। বেঁচে থাকো।
>
> ইন্দ্রজিৎ।। মানুষের বাঁচতে হলে বিশ্বাস দরকার। ভগবানে বিশ্বাস। অদৃষ্ঠে বিশ্বাস। কাজে বিশ্বাস। মানুষের বিশ্বাস। বিপ্লবে বিশ্বাস। নিজের ওপর বিশ্বাস। ভালোবাসায় বিশ্বাস। এর মধ্যে কোন বিশ্বাসটা আজ আমার আছে বলে বলতে পারি?"[১১]

নাটকের তৃতীয় অঙ্কে আমরা ইন্দ্রজিৎ-কে দেখে চমকে উঠতে হয়। এ কোন ইন্দ্রজিৎ? একদিন যে ইন্দ্রজিৎ চেয়েছিল প্রতিদিনের ছকবাঁধা একঘেয়েমি জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে, চেয়েছিল নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে, এ কি সেই ইন্দ্রজিৎ? তার সঙ্গে আজকের ইন্দ্রজিৎ-এর তো কোনো মিল নেই। আজকের ইন্দ্রজিৎ চাকরি করছে, সে অন্য এক মানসীকে বিবাহ করেছে, তারা একসঙ্গে সিনেমায়, হোটেলে যায়; আবার ইন্দ্রজিৎ প্রতিদিন বাজারও করে। ইন্দ্রজিৎ আর অস্তিত্বের সন্ধানে ব্রতী নয়। সে হয়ে উঠেছে ধরাবাঁধা এক মধ্যবিত্ত নাগরিক। তবে কি ইন্দ্রজিৎ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখবার লড়াইয়ে হেরে গেল? সেই কারণে কোটি কোটি মিথ্যে জীবনের মাঝে নিজের জীবনকেও বিলিয়ে দিয়েছে। ইন্দ্রজিৎ আর সেই 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নেই, সে হয়ে উঠেছে নির্মল। যে নির্মল অমল-বিমল-কমলদের মতোই একজন। যার আলাদা কোনো সত্তা নেই। তাইতো সে চিৎকার করে বলে ওঠে,

> "ইন্দ্রজিৎ।। না না নামানসী। ইন্দ্রজিৎ বলো না। আমি ইন্দ্রজিৎ নই। আমি নির্মল। অমল-বিমল-কমল। এবং নির্মল। আমি অমল-বিমল-কমল-নির্মল।"[১২]

নাট্যকার শম্ভু মিত্র তাঁর 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে মনসামঙ্গলের গল্পটিকে আদ্যোপান্ত ব্যবহার করেননি। কাহিনির সমাপ্তির অংশেও পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। মনসামঙ্গল কাব্যে ছেদ টানা হয়েছিল মনসার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়া অবনত অনুতপ্ত চাঁদের সবকিছু ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। এদিকে শম্ভু মিত্র সমকালে প্রেক্ষিতে নাটকের বিনির্মাণ ঘটিয়েছেন, তাই তাঁকে পরিবর্তন করতে হয়েছে নাটকের শেষাংশের মিলনাত্মক কাহিনির, তিনি সংযোজিত করেছেন সর্বাপেক্ষা আলোড়ন জাগানো ঘটনা বেহুলা ও লক্ষিন্দরের আত্মহত্যার কথা। এই নাটকের চরিত্ররা আর সেই মঙ্গলকাব্যের চরিত্র নেই, তারা হয়ে উঠেছে আমাদের সমাজেরই এক এক প্রতিনিধি। নাটকে আমরা লখিন্দরকে অস্তিত্বের সংকটে ভোগা এক যুবক হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। যে লখিন্দর হয়ে উঠেছে আমাদের সমাজেরই কোনো এক যুবক। লখিন্দর বলে ওঠে,

> "আমি যেন কতগুল্যা প্রতিক্রিয়া খালি। আমার অজ্ঞাতে যেন কীসব ঘটনা ঘটে আমার ভিতরে, আর আমি যেন শুধু তারি প্রতিক্রিয়াতেই কখনো-বা রাগ করি, কখনো-বা ভালোবাসি! কিন্তু আমি কে? আমারে তো খুঁজে আমি পাইনা কখনো। তাই,মাগো, বড় কষ্ট হয়-না, কষ্ট নয়-লোকে যারে বলে সেটা নয়,-কিন্তুক, কী এট্টা হয় যেন-অত্যন্ত অস্থির লাগে।-বল্যেকোনো লাভ নাই, -বোঝানো যাবে না।"[১৩]

আবার, কখনও বলে ওঠে,

> "আমি তো আমার এই সত্তাটারে ভালো কর্যে চিনি না এখনো? বলেছি তোমারে। তাইতো সন্ধান করি আমার এই রক্তের অন্তরে কোন ইতিহাস জেগ্যে বস্যে থেকে আমারে চালনা করে।"[১৪]

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লখিন্দর নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পাচ্ছে না, তাই তো সে নিজের সত্তাকেও চিনতে পারছে না, নিজেকেও চিনতে পারছে না। ক্রমশ অস্থির হয়ে পড়ছে সে।

নাটকে লখিন্দর ইন্দ্রজিৎ-এর মতোই কোন এক অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে চেয়েছে। লখিন্দর তার মাকে বলে,

> "আমারে এখানে হতে চল্যে যেতে দাও। এখনি আমারে দূর করে দাও। পিতার মতন আমারেও তুমি কোনো দূর দেশে পাড়ি দিতি দাও।"[১৫]

সেও ক্রমশ হাঁপিয়ে উঠেছিল ছকবাঁধা জীবনে। তাইতো নতুন ভাবে নিজেকে আবিষ্কার করতে কোন এক অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে চেয়েছে।

এক সময় লখিন্দর বেহুলার কাছে জানতে চায় যে, তার মনে মধ্যে যেরূপ অস্থিরতা দানা বেঁধেছে তা কি শুধু তারই মধ্যে বিদ্যমান, না কি তা সকলের মাঝেই দানা বেঁধেছে। লখিন্দর বলে,

> "আমার অন্তরে বাচনের যেই মতো আকর্ষণ, সেই মতো মরণেরও প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা। একি শুধু আমারি বৈলক্ষণ্য, নাকি সকলের? সমগ্র এ-মনুষ্যজাতির অন্তরে কি এই দুট্যা সুতা জট বেন্ধে নাই?"[১৬]

লখিন্দর বুঝতে পারছে না যেতার কি করণীয়? অপদার্থ, দুর্বল, ক্ষমতাহীন সে বলে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে। আবার পিতা-মাতার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে একাধিক প্রশ্ন। যে প্রশ্নের জবাব সে অনেকবার নিজে নিজে খোঁজার চেষ্টা করে বারবার বিফল হয়েছে। একসময় বেহুলার কাছে লক্ষিন্দর কে বলতে শোনা যায়,

> "ছোটোকাল থিক্যা সঙ্গীদের সাথে সাধারণ খেলাধুলা নিয়্যা স্বাস্থ্যের বাল্যকাল ছিল না আমার। চিরকাল রয়্যা গিছি যেন বিচ্ছিন্ন, একাকী। তাই সমাজের সাথে সাযুজ্য কামনা করি। জলের ভিতর জলচর জীবের মতন।"[১৭]

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় জীবনানন্দের 'বোধ' কবিতার সেই লাইনগুলো-

> "সকল লোকের মাঝে ব'সে
> আমার নিজের মুদ্রাদোষে
> আমি একা হতেছি আলাদা?
> আমার চোখেই শুধু ধাঁধা?
> আমার পথেই শুধু বাধা?"[১৮]

তবে এই বোধের তাড়নাতেই কি লখিন্দর সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন, একাকী জীবন অতিবাহিত করেছে? এই বোধ-ই কি তাকে স্থির থাকতে দেয়নি? তাকে ক্রমশ অস্থির করে তুলেছে।

নাটকে আমরা দেখতে পাই লখিন্দর বেহুলার কাছে একটু স্থির হয়ে বসতে চেয়েছিল, বেহুলার মধ্যেই নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পেতে চেয়েছিল।তবে নাটকের শেষাংশের পরিণতিতে নাট্যকার যা দেখিয়েছেন তা অতি ভয়ানক। নাটকের শেষে আমরা দেখতে পাই বেহুলা ও লখিন্দর এই যুগলের আত্মহত্যার দৃশ্য। লখিন্দর বেহুলাকে বলেছে,

> "অবিরাম এই কষ্ট বয়্যে বয়্যে কতো দিন-কেমন মানুষ হয়্যা-বেঁচ্যে রব আমি? বাসরের রাত্রে একবার মনে হয়্যেছিল দুইজনা মর্যে যাই। বেহুলারে,আজ সেই বাসরের রাত হোক। আমরা দু'জনা যেন ভালোবেস্যা বেস্যা মর্যে যেতে পারি।"[১৯]

লখিন্দরের পাশাপাশি এই নাটকে তার পিতা চাঁদও একই ভাবে অস্তিত্ব সংকটের শিকার। চাঁদ আলোর মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পেতে চেয়েছিল, তাইতো অন্ধকারের বিরুদ্ধে আলোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করছিল। তবে কলীদহে পড়ে তাকে বারবার বিপন্ন হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে।

চাঁদ নিজেকে চিনতে পারেনা, তার মনে প্রশ্নদানা বাঁধে -

> "কে আমি? কোথায় আমি?"[২০]

যে আচার্য বল্লভ চাঁদকে একদিন আদর্শের পথে থাকবার শিক্ষা দিয়েছিল, নাটকে আমরা দেখতে পাই সে আচার্য বল্লভই অন্ধকারের কাছে মাথা নত করেছেন। সেই কারণেই আশ্চর্য হয়ে যায় বলে,

> "আপনি কি সত্যই সেই ভট্টপাঠকবাসী আচার্য বল্লভ। আদর্শকে লক্ষ্য করে সাধনার উপদেশ আপনি কি দেন নাই আমাদের? কন নাই, সত্যেরই জয় হয়?- ভয় বাসি, মনে ভয় বাসি। গুরুদেব,এ ইন্দ্রপতন দেখ্যে আশঙ্কায় রক্ত হিম হয়্যা যায়।"[২১]

চাঁদ ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ে। তাকে কেউ বুঝতে চায়না, এমনকি নিজের সহধর্মিনীও তাকে ভর্ৎসনা করে।একেক সময় চাঁদ ভাবে সেও সবার মতো অন্ধকারে ঝাঁপ দিবে, আবার কখনও নিজেকে শেষ করে দেবার কথাও চিন্তা করে। শেষ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই, অস্তিত্বের সংকট জীবনানন্দের ভাষায় 'বোধ' কিম্বা 'মুদ্রাদোষ'-এর তাড়নাতেই চাঁদ সওদাগর মদ্যপানে নিজের সমাপ্তিকে ত্বরান্বিত করেছে।

১৯৬৩ সে সালে গন্ধর্ব পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম নাটক 'কণ্ঠনালীতে সূর্য', এক নিঃসঙ্গ নায়কের কাহিনি। চার অঙ্কের এই নাটকটি পুরোটাই ঘটেছে মিলুদের বাড়িতে। যেখানে আসে এক অপরিচিত লোক। গোটা নাটকের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে যার পরিচয় শুধুই লোকটি। প্রথম অঙ্কে মিলু ও সমীরের সঙ্গে কথোপকথনে লোকটির যে আচরণ ও অসঙ্গত কথা উঠে আসে তাতে এই অনুভবে পৌঁছানোই স্বাভাবিক যে লোকটি পাগল বা লোকটির মানসিক কোনো সমস্যা আছে। মিলু ও সমীরের অনুভব অনেকটা এইরকমই। নাটক যত এগিয়ে যাবে লোকটি সম্পর্কে মিলুর এই ধারণা পাল্টে যাবে। তার কথায় কবিতা কবিতা খুঁজে পাবে এবং একটা সহানুভূতিও তৈরি হবে। সমীরের প্রত্যয় তো বদলাবেই না উপরন্ত 'লোকটি একটি পাগল' এই প্রত্যয় আরো দৃঢ় হয়ে ওঠে।

আদতে লোকটি নিরুত্তাপ গোছের। হাসি, কান্নার মত সজীব অনুভূতিগুলো তার মরে গেছে বহুদিন। দাঁত, নখ, বার করে দাপট তো একেবারেই নেই। তবে খিদে আছে উদ্ভট রকমের। আর আছে ছোটবেলার হারানো স্মৃতির খোঁজ। আর একটা অসুখ আছে-

"লোকটি।। গলায় সূর্য আটকে আছে; টিউমারের মত ছোট থেকে এখন বিরাট হয়েছে। হঠাৎ-হঠাৎ কাশি হয়। খুব কাশলে সূর্যটা ভেঙে সাবান ফেনার বেলুনের মতো গোল- গোল অসংখ্য পিং-পং বল হয়ে চারিদিকে গড়িয়ে পড়ে।"[২২]

লোকটি মিলুদের বাড়িতে এসেছে নিরাময়ের আশায়। যে এক মৌলিক রোগের অধিকারী এবং এই রোগের কপিরাইট একমাত্র তারই। রোগটি অস্বাভাবিক মনে হলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে তো অস্বীকার করা যায় না।

> "অস্তিত্ববাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সবার উপরে গণ্য এবং সর্বত্রই ব্যাক্তি মানুষের ইচ্ছার জয়জয়কার। সবার উপরে ব্যক্তি সত্য, তাহার উপরে নাই।"[২৩]

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী লোকটি যে আলাদা সেটা বুঝা যায় এবং ইউনিক রোগের কপিরাইট দাবি করা লোকটিকে একক ভাবতেও কোনো দ্বিধার জায়গা তৈরি হয় না। কিন্তু লোকটি যখন বলে সময় সম্পর্কে সঠিক ধারণা তার গুলিয়ে গেছে।

> "সবাই ড্রপ খাচ্ছে-আপনি, আমি, টেবিল, চেয়ার। জানালা দিয়ে তাকান-রাস্তা, ল্যাম্পপোস্ট, লোকজন, গোটা পৃথিবী ড্রপ খাচ্ছে।"[২৪]

তখন রহস্যময়তা জেগে ওঠে। কে এই লোকটি? যার কবে জন্ম হয়েছে- তা সে ভুলে গেছে। সে মনে করে সম্ভবত তার বাবা-মা'র আগেই জন্ম হয়েছে তার। যার আত্মীয়েরা যুদ্ধে মারা গেছে আর সে নিজে যুদ্ধ করেছে গোলাপের বিরুদ্ধে। লোকটির নিজের নাম নেই। তবে তার নিজস্ব কিছু পরিচয় আছে। সেই পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন-

> "লোকটি।। লিখুন পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চির মনুষ্যাকৃতি প্রাণী। কণ্ঠনালীতে সূর্য আটকেছে, কপালে ধনুকের কাটা অদৃশ্য দাগ। ইচ্ছেমতো প্রচুর শাস্তি পেয়েছি। অপরাধ জানা যাচ্ছে না। জলের থেকেও মাটি কম বিপজ্জনক নয়, অনেকে ডুবেছে দেখেছি। ঘুমালে একটা মরা পতঙ্গের মতো, একদিন একপাল পিঁপড়ে মরা পোকা ভেবে তুলে নিতে এসেছিল। পিপাসা খুব বেশি, জলও বেছে বেছে খেতে হয় বলে বিপদ।"[২৫]

নিজের নাম বলার পরিবর্তে এই পরিচয় দিয়েছিলেন লোকটি। নাম হীনতার মাধ্যমে লোকটির অস্তিত্বহীনতা প্রতীকায়িত করা হয়েছে আসলে। অস্তিত্বশীল হওয়ার অর্থ হলো দেশ ও কালের সঙ্গে চরিত্রের সম্পর্ক যুক্ত হওয়া। কিন্তু লোককে তার সঠিক জন্ম সময় জানেন না। অপরাধ না করেই আজকে সভ্যতায় শাস্তি পেতে হয়। আধুনিক সভ্যতার যান্ত্রিকতা, নিঃসঙ্গতা, ক্লান্তি, বিচ্ছিন্নতা, উদ্বেগ, অস্থিরতা, অবসাদ, রক্তচাপ, হৃদরোগে প্রতিটি মানুষ আজ আক্রান্ত। যুগধর্মের কারণে নিরপরাধ মানুষদের সময়ের কাছে শাস্তি পেতে হয়।

আমাদের চেনা পরিসরে লোকটিকে বড় বেমানান মনে হয়। এই বেমানান মনে হওয়াটা আরো বেড়ে যায় লোকটি যখন নিজেকে কুকুর ভাবে, ডেকেও ওঠে। ডেকে ওঠার পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে-"অদ্ভুত, নিজেকেই খুঁজছিলাম আত্মানুসন্ধান নয়তো! লস্টলি এ ডগ রিয়ালাইজড্-আত্মানাং বিদ্ধি! দেন আই অ্যাম এ গ্রেট

মেটাফিজিক্যাল ডগ্। আই অ্যাম টু প্রিচ ডগ ফিলসফি। কুকুরের দর্শন প্রচার করতে হবে, লোভের দর্শন, উপেক্ষার দর্শন, ক্ষোভের দর্শন"[২৬] তখন রহস্যময়তা জেগে ওঠে।'আত্মানং বিদ্ধি' অর্থাৎ নিজেকে জানার এই জায়গায় লোকটি পৌঁছল কোন পথে? লোকটির এই অনুভব জন্মানোর মুহূর্তে খোঁজ পাওয়া যায় লোকটি যখন মিলুকে বলে;

> "অভাবে, লোভে, অপমানে, তাচ্ছিল্যে, অসম্মানে রাস্তার কুকুরের মতো চার পায়ে হেঁটেছি। গায়ে ঘৃণ্য লোম, হাতে পায়ে ছুঁচলো নখ, দাঁতে ঈর্ষার বিষ! চারিদিকটা কামড়ে দিতে চাই। কতগুলো লোক সাঁড়াশি দিয়ে আমাকে ধরবার জন্য ঘুরছে।"[২৭]

অজ্ঞাত পরিচয় লোকটির দুটি সত্তার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে নাটকে। একটি সত্তা নিরুত্তাপ, একটি আগ্রাসী তবে দুটি সত্তাই সংকটাপন্ন। প্রথম সত্তা কণ্ঠনালীতে সূর্য আটকে অস্থির। অসম্মানে, অপমানে দ্বিতীয় সত্তা মানবেতর প্রাণী হয়েও পায়নি। নাটকের চতুর্থ তথা শেষ অঙ্কে কালো পোশাকে আবৃত্ত কয়েকটি লোক দুটি সত্তার উপর যুগপৎ আতঙ্ক বাড়ায়, অবশেষে চলেও যায়। তখন বেঁচে থাকাকেই সেলিব্রেশন করে লোকটি। রক্তে ছারপোকা ঢুকে থাকা লোকটি, চিন্তার মধ্য বিরক্তিকর মাছি ঢুকে থাকা লোকটি বলে ওঠে-

> "আমি বেঁচে আছি। এর থেকে বড় খবর হয় না, বুঝলেন এর থেকে বড় খবর নেই।"[২৮]

এই বেঁচে থাকার আনন্দ, বাঁচতে পারার আনন্দ অজ্ঞাত পরিচয় লোকটিকে আমাদের চেনা পরিসরে এনে দেয়। লোকটি মিলুদের বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার আগে মিলুকে জানিয়েছে তার সূর্যের প্রতি আবাল্য ভালোবাসার কথা। "আসলে আমি সূর্যটাকে বড় ভালোবাসি ওটাকে ছাড়তে পারি না"[২৯]

নিঃসঙ্গ, পাগল, ব্যতিক্রমী এই মানুষটি তার একান্ত নিজস্ব যাপন দিয়ে অস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণ করছে।

> "প্রত্যেক মানুষই তার নিজস্ব ভঙ্গিতে জীবন ধারণ করতে চায় জীবনে কিছু হতে চায় এবং সেভাবেই জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা সে অন্তিম কাল পর্যন্ত করতে থাকে। তার একটা নিজস্ব চিন্তা, ইচ্ছা ও অনুভূতির জায়গা আছে। কাজেই সে এখনও যা নয়, অর্থাৎ যা হয়ে উঠতে পারেনি, স্ব-নির্ধারিত পথে তা হবার প্রচেষ্টার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তার অস্তিত্বের সার্থকতা।"[৩০]

'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকে আমরা দেখতে পেলাম যে, ইন্দ্রজিৎ অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে হেরে গিয়ে অন্যান্যদের মতো গতানুগতিক স্রোতধারায় গা ভাসিয়ে দিয়েছে অপরদিকে 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে লক্ষিন্দর বেছে নিলো আত্মহত্যার মতো ভয়ানক পথ। এরা আমাদের সমাজের সেই সমস্ত মানুষ গুলোকে প্রতিনিধিত্ব করছে যারা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার লড়াইয়ে হেরে গেছে। তারা কেউ বেছে নিচ্ছে লক্ষিন্দরের মতো ভয়ানক পথ, আবার কেউ ইন্দ্রজিতের মতো গতানুগতিক স্রোতধারায় গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। আসলে সবাই মুখোশের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। তাইতো লক্ষিন্দর 'চাঁদ বণিকের পালা' নাটকে বলেছে-

> "তুমি কী? কে তুমি? মানুষের নিজের তো এট্টা কোনো পরিচয় থাকা চাইনা কি, আমরা কেবল মুকুরের সমুখে দাঁড়ায়ে নানাবিধ ভূমিকায় অভিনয় কর্‍্যে-কর্‍্যে যাব? শুধুই মুখোশ? মানুষের মুখ নাই কোনো?- কী কর্‍্যে বোঝাই আমি?- এইসব সামাজিক পরিচয় পার হয়্যা অপরিবর্তিত কোনোসত্তা নাই মানুষের? মানুষ কি শুধু প্রতিক্রিয়া? শুধু প্রতিক্রিয়ার সমষ্টি? মানুষ?"[৩১]

Reference :

১. ভট্টাচার্য, শৈলেশরঞ্জন, অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২৮
২. সরকার, বাদল, এবং ইন্দ্রজিৎ, কথাশিল্প, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ২
৩. তদেব, পৃ. ৩-৪
৪. তদেব, পৃ. ৪
৫. তদেব, পৃ. ১৩
৬. তদেব, পৃ. ১১
৭. তদেব, পৃ. ২৬

৮. তদেব, পৃ. ৬১
৯. তদেব, পৃ. ৫৪
১০. তদেব, পৃ. ৬৬
১১. তদেব, পৃ. ৬৬
১২. তদেব, পৃ. ৭৯
১৩. মিত্র শম্ভু, চাঁদ বণিকের পালা , এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৪৭
১৪. তদেব, পৃ. ৬০
১৫. তদেব, পৃ. ৪৭
১৬. তদেব, পৃ. ১১৯
১৭. তদেব, পৃ. ১২৫
১৮. দাশ, জীবনানন্দ, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবী, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১৮
১৯. মিত্র,শম্ভু, চাঁদ বণিকেরপালা, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ১৬০
২০. তদেব, পৃ. ৬৯
২১. তদেব, পৃ. ১৫
২২. চট্টোপাধ্যায়, মোহিত, নাটকসমগ্র, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৮, পৃ.৯
২৩. আইয়ুব, আবু সয়ীদ, পথের শেষ কোথায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৭, পৃ.২০
২৪. চট্টোপাধ্যায়, মোহিত, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪০৮, পৃ.১২
২৫. তদেব, পৃ. ১৬
২৬. তদেব, পৃ. ২৫
২৭. তদেব, পৃ. ২৪
২৮. তদেব, পৃ. ৩৩
২৯. তদেব, পৃ. ৩৪
৩০. ভট্টাচার্য, শৈলেশরঞ্জন, অস্তিত্ববাদের মর্মকথা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ৯
৩১. মিত্র,শম্ভু, চাঁদ বণিকের পালা, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৬০